

মহামায়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BANGLADARSHAN.COM

॥মহামায়া॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল। মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গস্তীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিষ্ফেপ করিল। তাহার মর্ম এই, তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এ পর্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল— দুটো কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা-কোনো-কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল, “আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখানে হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।”

রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে-কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে-ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলংকার, এমন-কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে খতমত খাইয়া গেল—আরো দুটো-পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ-একটু নরম করিয়া আনিবে, তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা সুদ্ধ কেবল বলিল, “চলো, আমরা বিবাহ করিগে!”

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচাসোনার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক। তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন—তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত। রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুষনের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইঁহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন।

মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ষনুমে ষনুমে ষোলো, সতেরো, আঠারো, এমন-কি, উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুশি হইলেন ; মনে করিলেন, ছেলেটি তাহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল। এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাষন জোটে না। তাহারও কুমারী বয়স ষনুমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে-দেবতার কার্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এয়াবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো-চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না—তাহার নিস্তরক গস্তীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে। আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যতকিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে হয় আমরণ সুখ নয় আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, “চলো, তবে বিবাহ করা যাউক।” এবং তার পরে বিস্মৃতপাঠ ছাষেনর মতো খতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দিষ্ট করুনধনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তরকতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট এক-একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্তস্বার-সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল—মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমূলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শুক্ল পষনরাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সরসর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইত একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইল একপ্রকার শান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, সে হইতে পারে না।”

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর-কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কখনো রাজীবের মতো

অকুলীন ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক, মহামায়া বুঝিতে পারিল, তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়াছে ; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।”

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে—সে খবরে আমার কী আবশ্যিক। কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন।”

রাজীব কহিল, “আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদলি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।” মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দি করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া বলিল, “আচ্ছা।” সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “চাটুয্যে মহাশয়!” মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে।

রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিল—কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, “রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।”

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাহার অনুগমন করিল—আর, রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাশেনই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন, “এইটা পরিয়া আইস।”

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, “আমার সঙ্গে চলো।”

ভবানীচরণের আদেশ, এমন-কি, সংকেতও কেহ কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাষেন উভয়ে নদীতীরে শ্মশান-অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে।

সেখানে গঙ্গাযাষনীৰ ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল ; মহামায়া বুঝিল, এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাষনও প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আতর্ধ্বসির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাষন শোক অনুভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেইরূপ হইল না। এমন-কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর-একটা বজ্রঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধুম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদলি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে, “তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।” সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যিক হইলে দুই মাস, ষনুমে তিন মাস—এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মতো ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা নয় একটা-কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। যখন দেখিল বাহ্য প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনোরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাষন কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্মেন একটি স্ধনীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞনসা করিল, “মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?”

মহামায়া কহিল, “হাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সে অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বলো, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।”

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর-সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, “তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিয়ো—আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আর আমি বাঁচিব না।”

মহামায়া কহিল, “তবে এখনই চলো—তোমার সাহেব যেখানে বদলি হইয়াছে, সেইখানে যাই।”

ঘরে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এমনি ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মতো গায়ে বিঁধিতে লাগিল।

মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে, পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল।

বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাতপা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল।

অগ্নিও ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাঘাটের ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দন্ধ বস্মনখণ্ড গাষেন জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলে শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদূরবর্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানিমাষন ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালষনুমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনের আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষত মহামায়া পুরাণবর্ণিত কর্ণের মতো সহজকবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে, অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এতদূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে আসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষয়ন যেমন প্রতিরাষিন নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেষন অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিয়াপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একঘন যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাষেন প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিষ্পন্দ জ্যোৎস্নারাষিন সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাষেন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাষিনর মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাষিন তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হয়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়। চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল, এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল—পায়ে ধরিয়া কহিল, “আমাকে ক্ষমা করো।”

মহামায়া একটি উত্তরমাষন না করিয়া, মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব শেষাধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দন্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

ফাল্গুন, ১২৯৯

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM